কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ব্রিফিং নোট ৩৭

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিক-ভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দূর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

করোনা অতিমারি জাতীয় ও বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষতির সৃষ্টি করেছে। সমগ্র বিশ্ব যখন এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠছিলো, ঠিক তখনই ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলাদেশও সে অনিশ্চয়তার ফল ভোগ করছে। বিশেষত, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল ভেঙে পড়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বেড়েছে। পিছিয়ে পড়া মানুষ নতুন করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ অবস্থায় কিছুদিনের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঘোষণা করা হবে। এই প্রেক্ষাপটে ১৬ মে ২০২২ তারিখে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ, একটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে। ব্রিফিংয়ে উপস্থিত নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা সামগ্রিকভাবে তাদের সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বাজেটের সাথে জড়িত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বিশ্লেষণ করে।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, জাতীয় বাজেট ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের প্রত্যাশা

সূচনা বক্তব্য

প্রারম্ভিক বক্তব্যে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়ক আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ বলেন, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের প্রাক-বাজেট আলোচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। সেখানে সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিরা তাদের বাজেট প্রত্যাশা নিয়ে আলোকপাত করে থাকেন। বর্তমান আলোচনায় চলমান বাজেট নিয়ে চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরা হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এর পাশাপাশি বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। তিনি বলেন, এ কথা জানা আছে যে এসডিজির সময়কাল শেষ হতে আর মাত্র আট বছর বাকি আছে এবং কোভিড পরিস্থিতি আমাদেরকে বেশ পিছিয়ে দিয়েছে। তাই এবারের বাজেট থেকে জনগণ কী প্রত্যাশা করছে সে বিষয়ে আলোচনা আমরা এসডিজির দৃষ্টিকোণ থেকে করতে চাই।

সভাপতির সূচনা বক্তব্যে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেন, একটি ব্যতিক্রমী সময়ে আগামী ৯ জুন জাতীয় সংসদে এবারের বাজেট উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে। একদিকে কোভিড পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা চলছে, অন্যদিকে অর্থনীতি একটি উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপের মধ্যে রয়েছে। এ বাজেটে ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা ও জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা যা সাধারণ মানুষের জন্য ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসবে। সেসব বিষয় নিয়ে অংশীদাররা আলোচনা করবেন। আগামী বাজেটের নিরিখে এ আলোচনা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো,

আমরা সাধারণত কোন্ সূচক গড় হিসাব করে বিশ্লেষণ করে থাকি। কিন্তু এ গড়ের বাইরে অনেক বণ্টনের ব্যাপার আছে, ন্যায্যতার ব্যাপার আছে, হিসাবের ব্যাপার আছে— যে বিষয়গুলো অনেক সময় চাপা পড়ে যায়। আজকের আলোচনায় আমরা বিভাজিত অভিঘাত নিয়ে আলোচনা করবো। গড়ের হিসাবে আমরা হয়তো ভালো করছি; কিন্তু সমাজে যারা প্রান্তিক অবস্থায় আছেন, তারা কীভাবে এ বাজেট থেকে উপকৃত হবেন— এ ধরনের বিষয়গুলো গড়ের আলোচনার বাইরে নিয়ে আসাটা এখন অত্যন্ত প্রয়োজন। এ প্ল্যাটফর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যারা পিছিয়ে আছেন তাদের জন্য বাজেট অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কি সুফল নিয়ে আসছে তার পর্যালোচনা করা, এসব বিষয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা। আমাদের এ আয়োজনের উদ্দেশ্য সেটাই।

দুর্বল কাঠামোর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে দেশের অর্থনীতি

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, প্রত্যেকটা বাজেটেরই একটি বিশেষ প্রেক্ষিত থাকে এবং এ বছরের বাজেটের নিরিখে তিনটি বিশেষ প্রেক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ২০২০ সালের মার্চ মাসে দেশে অতিমারির প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার আগে ২০১৮–১৯ ছিল বাংলাদেশের সর্বশেষ স্বাভাবিক অর্থবছর। সে সময়ে দেশের অর্থনীতির যে পরিস্থিতি ছিল, সেখানে আমরা এখনো ফেরত যেতে পারিনি। কিছু ক্ষেত্রে উত্তরণ ঘটলেও সম্পূর্ণরূপে অতিমারি-পূর্ব পরিস্থিতিতে উত্তরণ ঘটেনি। এই বাস্তবতা নিয়েই আমাদের আগামী অর্থবছরের বাজেটে প্রবেশ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক যে সংকট চলছে, সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা যে ধরনের বিচ্যুতি ও প্রতিবন্ধকতা দেখতে পাচ্ছি এবং এর পাশাপাশি পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এক ধরনের অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে সেটাও প্রণিধানযোগ্য। এ পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের ২০২২–২৩ অর্থবছর অতিবাহিত করতে হবে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তৃতীয়ত, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যিক, আর্থিক ও ব্যাংক খাতে যে বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে বাংলাদেশে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধিসহ সার্বিক অর্থনীতি যে চাপে পড়েছিল, তার পরে এবারই সম্ভবত সামষ্টিক অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি চাপ বা টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর কারণে বিশ্বব্যাপী সংকট এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতিতেও বড় ধরনের নেতিবাচক অভিঘাত দৃশ্যমান হচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, বিগত সময়ে বাংলাদেশের আয়-ব্যয়ের যে পরিস্থিতি ছিল, সেই কাঠামোটি সর্বদাই দুর্বল ছিল এবং তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এর লক্ষণ হলো, আমাদের কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশের ওপরে ওঠেনি। একই সঙ্গে উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য যে বিনিয়োগ, তার তুলনায় সরকারে পরিচালন ব্যয় বা রাজস্ব ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি অনেক বেশি তেজি। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে সেই অর্থে বাজেট ঘাটতি বাড়ছে না। এর কারণ, একদিকে সম্পদের অভাব, অন্যদিকে সম্পদ যথোপযুক্তভাবে খরচ করার ক্ষেত্রে সক্ষমতার অভাব। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের অভাবের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গুণমানসম্পন্ন উপায়ে অর্থ বিনিয়োগ করতে না পারা। বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবে আর্থিক কাঠামোতে কিছু দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে; যেমন— আদায় ও কম ব্যয় সক্ষমতা। অবশ্য এর ফলশ্রুতিতে নিয়ন্ত্রিত বাজেট ঘাটতি থাকছে। এ পরিস্থিতি আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে। এটি কোনোভাবেই অর্থনীতির শক্তির লক্ষণ নয়।

রিজার্ভ বড় ধরনের টানাপোড়েনের মধ্যে পড়বে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের এ সময়কালে একটি শক্তির জায়গা ছিল বৈদেশিক খাত। রপ্তানি, প্রবাসী আয়, বৈদেশিক সাহায্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ শক্তিশালী থাকায় বৈদেশিক আয়-ব্যয়ের সার্বিক ভারসাম্যে বাংলাদেশ শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। চলতি ব্যয়ের সাধারণ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, গত বছর ঘাটতি ছিল ৫৫৫ মিলিয়ন ডলার, যেটি এখন ১৪৭২ মিলিয়ন ডলারে চলে গেছে। আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ঘাটতির বিষয়টি আরও প্রকট। বাংলাদেশের রপ্তানি এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে এবং এর কারণ মূলত আমদানিকৃত উপকরণের দাম বৃদ্ধি। এর লক্ষণ হচ্ছে আমদানি এতটাই বেড়েছে যে, এরই মধ্যে চলতি অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘাটতির প্রতিফলন দেখা যাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর যেটি ক্রমান্বয়ে কমে

আসছে, যে ধারা গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। বিশ্বে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার কারণে আমদানি-রপ্তানি ঘাটতি যদি বাড়তে থাকে, তাহলে দেশের রিজার্ভে বড় ধরনের টান পড়বে। এর ফলে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদশ ব্যাংকের বাজারে ডলার ছাড়ার সক্ষমতা সীমিত হয়ে যাচ্ছে। বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে বিগত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যে চার-পাঁচ বিলিয়ন ডলার বাজারে ছেড়েছিল, এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে ডলারের বিনিময়ে টাকার মূল্য হ্রাস পেতে পেতে এক ডলারের বিনিময় মূল্য এখন ১০০ টাকা ছাড়িয়েছে। রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি বৈদেশিক খাতেও বড় ধরনের দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রদত্ত মূল্যস্ফীতির হিসাব বাস্তবসম্মত নয়

মূল্যস্ফীতির বিষয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন, সাধারণভাবে সরকারের হিসাব অনুযায়ী মূল্যস্ফীতি বর্তমানে ছয় শতাংশের কিছুটা বেশি। তবে বিদ্যমান বাস্তবতার সঙ্গে এটি কোনোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। গ্রাম পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি শহরের তুলনায় বেশি এবং খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশি। দেখা যাচ্ছে গ্রামপর্যায়ে খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি ৬.৭ শতাংশ এবং জাতীয় গড় মূল্যস্ফীতি ৬.২২ শতাংশ। সাধারণভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তেল, ডাল, ডিম, আটা-ময়দা, মুরগি, মাছ, দুধ ইত্যাদির মূল্যের ক্ষেত্রে টিসিবি গত এক বছরের যে তালিকা দিয়েছে, তার সঙ্গে বিবিএসের উপাত্তের কোনো সামঞ্জস্য নেই। অনেকেই বলেন, আমাদের দেশে যেসব আমদানিকৃত পণ্য রয়েছে, তার দাম প্রতিবেশি দেশের তুলনায় কম, যেটি সঠিক নয়। টিসিবি'র তথ্যে দেখা যাচ্ছে, যদি বাংলাদেশে এক লিটার পাম অয়েলের দাম ১৮৩ টাকা হয়, তাহলে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় মূল্য অনুযায়ী ভারতে সেটি ১৭৩ টাকা। যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে ভারতে দাম বেশি তা হলো, তেল ও ডিজেল। বাংলাদেশ যেহেতু এখানে ভর্তুকি দেয়, সেহেতু এগুলোর মূল্য ভারতে তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি।

বিবিএস প্রদত্ত মূল্যস্ফীতির হিসাব বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ বিবিএস ভোক্তা মূল্যসূচক হিসাব করে ১৭ বছরের আগের অর্থবছর ২০০৫–০৬ এর ভিত্তিতে। এই সময়ের মধ্যে মানুষের ভোগকাঠামোতে যে পরিবর্তন হয়েছে বিবিএসের হিসাবে তা ধরা হয়নি। এছাড়া অসুবিধাগ্রস্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেসব পণ্য ও সেবা ব্যবহার করে তার অনেক কিছুর হিসাব এখানে নেই, অথচ অনেক ক্ষেত্রে সেসব পণ্যের দাম তুলনামূলকভাবে দ্রুত হারে বেড়েছে। সেজন্য বিভাজিত পর্যায়ে মানুষ যে কষ্টের মধ্যে রয়েছে, গড় মূল্যস্তরে তার প্রতিফলন হয়নি। এছাড়া উচ্চমূল্যে বর্তমানে পণ্য আমদানি করতে হচ্ছে। এসব পণ্য বাজারে এলে এবং সরকার যদি মূল্য সমন্বয়ের নামে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম বাড়ায়, তাহলে মূল্যস্ফীতি আরও বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে ভর্তুকি সমন্বয় করে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রাখলে ভোক্তারা উপকৃত হবেন।

মূল্যস্ফীতি ও টাকার বিনিময় হারের সঙ্গে সুদহার সমন্বয় করতে হবে

সুদের হারের বিষয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন— মূল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধি, অন্যদিকে টাকার মূল্যমান কমে যাওয়া অর্থনীতিতে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে। যে কোনো দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখার প্রয়োজনে সুদের হার, বিনিময় হার ও মূল্যস্ফীতি— এ তিনটি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। টাকার মূল্যমান কমছে, মূল্যস্ফীতিও ঘটছে, কিন্তু সুদের হার একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে যাতে বিনিয়োগ বাড়ে। কিন্তু সুদের হার কমিয়ে বিনিয়োগ বাড়ানো যাবে, এই তত্ত্ব বাংলাদেশের জন্য কার্যকর নয়। কারণ দেশে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তার মধ্যে সুদ সামান্য একটি অংশ। বর্তমানে আমানতের সুদের গড় হার ৪ শতাংশের কিছুটা বেশি। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি ৬.২২ শতাংশ। এতে ব্যাংকে টাকা রাখলে তার প্রকৃত মূল্য প্রতিবছর দুই শতাংশ করে কমে যাবে। কাজেই সুদের হার আটকে রাখা এক ধরনের সঞ্চয়বিরোধী নীতি। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতিকে কেন্দ্রীয় সূচক বা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সুদের হার বাড়াতে হতে পারে। যদি সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রান্তিক মানুষ এবং নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যাদের আয় সেই হারে বাড়ে না যে হারে বাজারে পণ্যমূল্য বাড়ে। কাজেই আগামী বাজেটে যদি একটিমাত্র

বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হয়, তাহলে সেটি হতে হবে মূল্যস্ফীতি এবং সেই সাথে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

নিম্ন আয়ের মানুষের সঞ্চয় হ্রাস প্রভাব ফেলছে বিনিয়োগে

বিগত সময়ে আমরা দেখেছি জিডিপির অনুপাতে মোট বিনিয়োগ হার কোনো অবস্থাতেই ৩৩ শতাংশের বেশি বাড়ানো যাচ্ছে না। এর মধ্যে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ হার আটকে আছে ২৩-২৪ শতাংশের মধ্যে, যা ২০১৯ সালে ২৫ শতাংশের মতো ছিল। কিন্তু সেখানে এখনো আমরা ফিরে যেতে পারিনি। প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বর্তমান বিনিয়োগ পরিস্থিতির সাযুজ্যতা নেই। সম্পদ ও বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতাও অনেক কমে যাচ্ছে। সরকার ২০২১–২২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে প্রাক্কলন দিয়েছে, তাতে দেখা যায়, বৃহৎ শিল্পে প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৩ শতাংশের কাছাকাছি। অন্যদিকে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে এ হার ১১ শতাংশের নিচে। অর্থাৎ, যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে তা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের তুলনায় বৃহৎ শিল্পকে বেশি সুযোগ করে দিচ্ছে। যা বৈষম্য বাড়াচ্ছে ও সৃজনে সমস্যা সৃষ্টি করছে। কাজেই আগামী দিনে বিনিয়োগ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বেশি আসতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারমুখী শিল্পকে বেশি সমর্থন দিতে হবে। অতিমারি চলাকালীন জাতীয় সঞ্চয়ের হার ছিল ৩১ শতাংশের ওপরে। এখন তা সাড়ে ২৫ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। সঞ্চয় কমে যাওয়ার অর্থ হলো এখন প্রতিটি খানাকে ভোগের জন্য অনেক বেশি ব্যয় করতে হচ্ছে। নিম্ন আয়ের মানুষের সঞ্চয়ের পতন অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার আভাস দিচ্ছে। এ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কর্মসংস্থানে জোর দিতে হবে। প্রথমত জোর দিতে হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে; দ্বিতীয়ত, যুবসমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে; এবং তৃতীয়ত, অনানুষ্ঠানিক খাতে নজর দিতে হবে। কারণ এ মুহূর্তে কাজের অভাবে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য বেকারত্বের কারণে এই অনানুষ্ঠানিক খাতে মানুষ জড়ো হচ্ছে। কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশে উৎপাদনশীলতা এবং গুণমানসম্পন্ন শ্রমশক্তি গড়ে উঠবে না।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হার লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গত মার্চ পর্যন্ত বাস্তবায়নের হার ছিল ৪১ শতাংশ। আমরা তিনটি খাতকে বেছে নিয়েছি— শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা। এ তিন খাতে মোট এডিপি বরাদ্দ ছিল প্রায় ২৮ শতাংশের মতো। এখানে দেখা যাচ্ছে, সার্বিক এডিপি বাস্তবায়ন ৪১ শতাংশ হলেও এ তিন খাতে ৩৫ শতাংশের নিচে। ২০২০–২১ অর্থবছরে এই বাস্তবায়নের যে হার ছিল, এবার তার চেয়েও কমে গেছে। এটি একটি বড় দুর্বলতা।

নিম্নবিত্তের হাতে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ দিতে হবে

এই মুহূর্তে যদি নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ না দেয়া হয়, তাহলে সঞ্চয়ের যে পতন ধারা দেখা যাচ্ছে, তা তাদের আরও আর্থিক কৃচ্ছ্রতার মধ্যে ঠেলে দেবে বলে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন। তিনি আরও বলেন, করমুক্ত আয়সীমা বর্তমানের তিন লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে তিন লাখ টাকায় উন্নীত করা উচিত। সাধারণভাবে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা রোজগার করা নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তকে যদি সুরক্ষা না দেয়া হয়, তাহলে তাদের জীবনমান আরও কষ্টের মধ্যে চলে যাবে। তিনি তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর আরোপ করেন। এর প্রথমটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা; দ্বিতীয়টি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এবং তৃতীয়টি হলো এগুলো করার পরও সবচেয়ে প্রান্তিক, দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেটা প্রণোদনা বা অন্য যে কোনো আকারে হতে পারে।

বিগত ১৭ এপ্রিল ২০২২, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বিভিন্ন খাতের মানুষদের নিয়ে একটি সংলাপের আয়োজন করে, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বাজেট বিষয়ে বেশকিছু সুপারিশ দিয়েছিলেন। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তার উপস্থাপনায় সেই আলোচনায় উঠে আসা সুপারিশগুলো তুলে ধরেন:

১. জিডিপিকে প্রাধান্য দেয়ার পরিবর্তে কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দিয়ে বাজেট প্রণয়ন ও নিরূপণ করা উচিত। তবে কেবল কর্মসংস্থান হলেই হবে না, এ কর্মসংস্থানকে সর্বদা মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখতে হবে। দেশে ও দেশের বাইরে কোথায় কীভাবে কোন্ ধরনের কর্মসংস্থান হচ্ছে তার একটি মূল্যায়ন থাকা প্রয়োজন।
২. দুস্থ মানুষের জন্য আরও বেশি খাদ্য ও আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।
৩. অতিমারির কারণে যেসব নেতিবাচক প্রভাব সমাজে দেখা গেছে, তা মোকাবেলায় বাজেটে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে বাল্যবিয়ে, শিশুশ্রম ও স্কুল থেকে ঝরে পড়ার মতো বিষয়সমূহ। শিশুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারেরও উদ্যোগ থাকা উচিত।
৪. এমপিওভুক্তির বাইরে থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। এই বাজেটে এমপিওভুক্তির বাইরে থাকা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সহায়তা দেয়া খুবই প্রয়োজন।
৫. যুবসমাজের জন্য এডুকেশন ক্রেডিট কার্ড চালু করতে হবে। বছরে অন্তত এক লাখ টাকা ঋণ নিয়ে তারা শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে।
৬. শিক্ষাক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিত শ্রেণির জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।
৭. লিঙ্গবৈচিত্র্যের জনগোষ্ঠীর কর্মসৃজনের জন্য ব্যাংকের ঋণপ্রাপ্তি সহজ করতে হবে।
৮. কৃষির সম্প্রসারণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে আরও জনবল বৃদ্ধি ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করতে হবে।
৯. সরকারের ধান-চাল সংগ্রহের মূল্য আরও সঠিকভাবে কার্যকর করতে হবে।
১০. সার ও উচ্চফলনশীল ফসলের বীজের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে।
১১. অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের নীতি সুরক্ষা কাঠামোয় আনতে হবে।
১২. শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা ও স্বাস্থ্যকার্ড চালু করতে হবে।
১৩. সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষার ভাতা মাসে ন্যূনতম এক হাজার টাকা নির্ধারিত করতে হবে।
১৪. অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অভিন্ন, সংযুক্ত ও সম্পূর্ণ তথ্যভাণ্ডার প্রণয়ন করতে হবে। কারণ এ তথ্যভাণ্ডার না থাকার ফলে সরকারের নীতি থাকা সত্ত্বেও সরকারি সমর্থন যাদের প্রাপ্য, তারা তা পাচ্ছেন না।

সরকারের তরফ থেকে যে সামাজিক সুরক্ষার কথা জোর গলায় বলা হয়, তার প্রকৃত পরিমাণ কত? আমাদের হিসাবে জিডিপির অনুপাতে গত কয়েক বছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। কিন্তু তাতে প্রান্তিক ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কমই উপকার হয়েছে। অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রদেয় মাসিক ন্যূনতম এক হাজার টাকা ভাতা নির্ধারণ করতে হবে যা তাদেরকে সরাসরি দিতে হবে। আর বিদ্যমান কর্মসূচিগুলোর পাশাপাশি যুবভাতা চালু করতে হবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আগে প্রতি চারজন শিক্ষিত যুবকের মধ্যে একজন বেকার ছিল, যা এখন তিনজনে একজন হয়েছে। তার মতে, আগামী দিনে ভর্তুকির মাধ্যমে বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দাঁড়াবে। কাজেই ভর্তুকির মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং এটিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ও জ্বালানি ভর্তুকি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভর্তুকির বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। যে সকল মেগা প্রকল্পগুলো এখন শেষের দিকে সেগুলো থেকে আর্থিক সুবিধা কতটা পাওয়া যাবে, সেটিও এখানে যুক্ত হবে। ভর্তুকির টাকা যাতে এসব মেগা প্রকল্পের ব্যয় মেটাতে ব্যবহৃত না হয়, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়নে মানুষের কণ্ঠস্বর জোরালো করতে হবে

সবশেষে দেবপ্রিয় ভট্টাচর্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করেন। প্রথমত, বৈশ্বিক বাস্তবতার পাশাপাশি আর্থিক খাতে দুর্বলতার জন্যও প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ না নেয়ার কারণে ২০২২–২৩ সালকে একটি দুর্যোগপূর্ণ বছর হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এমন বাস্তবতায় সঠিক নীতি ব্যবস্থাপনা আগামী অর্থবছরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই আগামীতে অগ্রগামী পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থাপনা চালু করতে হবে, যাতে কোনো একটি ঘটনা ঘটার আগেই ব্যবস্থা নেয়া যায়। দ্বিতীয়ত, আমাদের তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি আছে। ফলে সঠিক সময়ে সঠিক

পদক্ষেপ গ্রহণ এ কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রতি তিন মাস পর পর সংসদে দেশের সার্বিক আর্থিক পরিস্থিতি তুলে ধরার বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধ্যকতা থাকলেও তা পরিপালন করা হচ্ছে না। এটি সঠিকভাবে পরিপালন করতে হবে। সবশেষে মানুষের কণ্ঠস্বর যদি না থাকে, তাহলে যত বরাদ্দই দেয়া হোক না কেন, তার পর্যাপ্ত ব্যবহার হবে না। তাই আগামী দিনে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন অংশের জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর জোরদারের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন মূল প্রতিবেদন উপস্থাপনায় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উঠে এসেছে, যে বিষয়গুলো এবারের বাজেট প্রণয়নের নিরিখে অত্যন্ত সময়পোযোগী ও প্রয়োজনীয়। কর্মসংস্থানের ওপর জোর দিতে হবে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষার যে পরিধি রয়েছে, সেটির আরও বিস্তৃতি ও তার প্রাপ্যতা বাড়াতে হবে। এর ফলে বাজেটে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে না। আর সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি ও প্রাপ্যতা বাড়ানো দরকার কারণ, দেশে যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, তার সুষম বণ্টন হচ্ছে না এটা বিবিএসের তথ্য থেকেও দেখা যাচ্ছে। এখানে এক ধরনের কেন্দ্রীভূতকরণ চলছে এবং এই কোভিডের কারণে সেটি আরও ঘনীভূত হয়েছে। কাজেই আগামী বাজেটে সম্পদ বণ্টনের ন্যায্যতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাড়াতে হবে শিশু বাজেট

শিশু ও শিশুদের শিক্ষার ওপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নিয়ে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের পরিচালক টনি মাইকেল গোমেজ বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছরে সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন সময়কালে কয়েক লাখ কোটি টাকার যে বাজেট প্রণয়ন করে এবং তাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ভিত্তিক যে বরাদ্দের কথা শোনা যায়, সেগুলো আমাদের বেশ মন ভরায়। বরাদ্দ বাড়ানোর প্রতিফলন প্রতিবছরের বাজেটেই দেখা যায়। কিন্তু বাজেট বাস্তবায়নে তার প্রতিফলন কম। যদি শিশুর সঙ্গে বাজেটকে সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে দেখা যায় শিশুর জন্য পৃথক কোনো বাজেট নেই। সর্বমোট ১১টি মন্ত্রণালয় বিভিন্নভাবে শিশুর জন্য কাজ করে। এর মধ্যে কিছু কিছু মন্ত্রণালয়ের শতভাগ খরচকে শিশুর জন্য খরচ বলে বিবেচনা করা হয়, যেমন ধরে নেয়া হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যা কিছু খরচ হয়, তার সবটাই শিশুর জন্য। ধরে নেয়া হয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ৩৪ শতাংশ খরচ শিশুর জন্য যায়। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে যে ব্যয় হয়, তার একটি বড় অংশ শিশুর জন্য খরচ হয়। এভাবে শিশু বাজেটের বিষয়ে একটি বিশ্লেষণ আছে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে। গত অর্থবছর এ মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট ছিল তিন হাজার ৮৬০ কোটি টাকা, যা চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য চার হাজার ১৯১ কোটি টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এই যে সাড়ে ৩০০ কোটি টাকার বরাদ্দ বেড়েছে, এটি নিশ্চিত যে এর পুরোটা এবং সঙ্গে আরও বেশকিছু পরিমাণ অর্থ ব্যায় হবে না।

বাজেট পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রকৃত বাজেট ব্যয় কখনোই গড়ে প্রাথমিকভাবে প্রাক্কলিত বাজেটের ৭৫ শতাংশের বেশি হয় না। আজকের প্রবন্ধে বাজেট বাস্তবায়নে দুর্বলতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এই যে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নানামুখী বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, সেটি আসলে যাদের প্রাপ্য, তাদের অনেকের কাছেই পৌঁছাচ্ছে না। এখানেই বাস্তবায়নের সমস্যা চলে আসে। এক্ষেত্রে বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন এক দুষ্টচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

শিশুশ্রম ও বাল্যবিয়ে রোধে বিশেষ নজর দিতে হবে

শিশুশ্রমের বিষয়ে টনি মাইকেল গোমেজ বলেন, উন্নয়নে আমরা এত এগিয়ে গেছি, মাথাপিছু আয় বেড়েছে এবং মধ্যম আয়ের দেশ হয়েছি; কিন্তু এখনো সমাজ থেকে শিশুশ্রমের মতো অনেক বিষয় আমরা দূর করতে পারিনি। কীভাবে এটি করা যায় এবং কোন্ প্রণোদনা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেলে আমাদের দেশের শিশুরা শ্রমে নিযুক্ত হবে না, তা আমাদের জানা নেই।

তিনি বলেন, বাল্যবিয়ে বন্ধ করা যায়নি। আমাদের দেশের দারিদ্র্য, নিম্নআয় ও নিম্নমধ্যম আয়ের মানুষের এর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। ১১.৬ মিলিয়ন মানুষ এখনো বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে। তাহলে ধরে নেয়া যায় এই দরিদ্র পরিবারগুলো থেকে শিশুশ্রম হবে, বাল্যবিয়ে হবে এবং এই পরিবারগুলোর শিশুরা পাচারের শিকার হবে। কাজেই বিভিন্ন মাপকাঠিতে যে গড়ের আনন্দ, তা আমরা উপভোগ করতে পারছি না; কারণ আমরা এসডিজি নিয়ে কাজ করি এবং আমাদের দর্শনই হলো, 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না।' কিন্তু যখন আমরা গড়ভিত্তিক সাফল্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবো, তখন জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে যে আমরা পেছনে ফেলে যাব, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কোভিডকালে শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃষ্ট ক্ষতের বিষয়ে তিনি বলেন, কোভিডকে বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, কোভিডের আগে প্রত্যেকটি শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য স্কুলে পাঠানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া এবং বিষয়ভিত্তিক টিউটর দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে বিদ্যমান, সেখানে দুই বছর শিশুদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কোভিডের আগের প্রথম শ্রেণির একটি শিশু এখন তৃতীয় শ্রেণিতে উঠে গেছে। আর যারা তৃতীয় শ্রেণিতে ছিল, তারা পঞ্চম শ্রেণিতে প্রমোশন পেয়েছে। তার মানে, যে কখনো অ্যালজেবরা করেনি, সে হঠাৎ করে ত্রিকোণোমিতি পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু এই বাড়তি শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত হবে কী করে, যদি বাড়তি বরাদ্দ ও বাড়তি প্রচেষ্টা নিশ্চিত করা না হয়? একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তৃতীয় শ্রেণির শিশুরা বাংলা দেখে পড়তে পারছে না, কারণ শ্রেণিকক্ষে বিষয়গুলো ধরে ধরে তাদের শেখানো হয় না। অনেক সময়ই শ্রেণিকক্ষে এত বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী থাকে যে শিক্ষকের পক্ষে সবাইকে শেখানো সম্ভব হয় না। ফলে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এই গুণগত মান নিশ্চিত হবে তখনই যখন উপযুক্ত জায়গায় বিনিয়োগ বাড়বে। এজন্য স্থানীয় সরকার পর্যায় পর্যন্ত শিশু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পেছনে অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। শিশুদের জন্য একটি আলাদা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে; কিন্তু এখনো তা কার্যকর হয়নি।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ২০১৮ সালে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে 'ব্লুমিং চিলড্রেন রিপোর্ট' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে সরকারি ব্যয়ের ২০ শতাংশ শিশুদের জন্য বরাদ্দ দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, এখন এ হার ১৫ শতাংশের মতো। টনি মাইকেল গোমেজের বক্তব্যের সারমর্ম করে তিনটি বিষয় তিনি উল্লেখ করেন— বরাদ্দের পরিমাণ, লক্ষ্যনির্দিষ্ট বরাদ্দ নির্দিষ্টকরণ এবং তার বাস্তবায়ন। এ তিন ক্ষেত্রেই অনেক সমস্যা রয়েছে এবং কোভিডকালে এ সমস্যাগুলো আরও ঘনীভূত হয়েছে।

জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ

স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক রুমানা হক বলেন, শিশুমৃত্যু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাসকরণ এবং গড় আয়ু বৃদ্ধির মতো ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের অনেক অর্জন আছে। আমাদের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি সারাবিশ্বেই একটি রোল মডেল হিসেবে কাজ করেছে। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে যাওয়ার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি করা হয়েছে, যেটি অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ হয়েছে। বাজেট আলোচনার প্রেক্ষাপটে একটু পেছনে ফিরলে দেখা যায়, ১৯৯৮ সালে যখন পাঁচ বছর মেয়াদি প্রথম স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল, সেখানে বাজেট ধরা হয়েছিল ১১ হাজার ৫২০ কোটি টাকা। আর সর্বশেষ ২০১৭ সালে পাঁচবছর মেয়াদি যে চতুর্থত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল, সেখানে বাজেট ধরা হয় এক লাখ ১৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকার মতো। অর্থাৎ ১৯৯৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচিতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে প্রায় ১০ গুণ, সুতরাং সেটি নিঃসন্দেহে একটি বড় সাফল্য। কিন্তু মোট জাতীয় বাজেটের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য বাজেট অত্যন্ত হতাশাজনক। মোট বাজেটের মাত্র ছয় শতাংশ এ খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়, যেটা খুবই অপ্রতুল। এতে প্রমাণিত হয়, স্বাস্থ্যখাতকে যেভাবে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন, তা দেয়া হচ্ছে না।

বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে রুমানা হক বলেন, আমাদের দেশে সেবাগ্রহণকারীর ব্যক্তিগত ব্যয় (আউট অব পকেট এক্সপেন্ডিচার) অনেক বেশি। মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৭৪ শতাংশই নাগরিকদের নিজেদেরই বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে যদি স্বাস্থ্যসেবা দিতে চাই, তাহলে অবশ্যই স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্য খাতকে ব্যয়ের খাত হিসেবে না দেখে বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে রোগ হওয়ার পর চিকিৎসার পরিবর্তে রোগ হওয়ার আগে যাতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া যায়, সে ধরনের কর্মসূচিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের ঘাটতি রয়েছে। এটির উন্নতি সাধনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। সেজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগসহ অন্যান্য পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের দেশে জরুরি স্বাস্থ্যসেবাও খুবই দুর্বল। এ খাতে আরো বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন।

আগামী বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের জন্য আমাদের প্রত্যাশা হলো, এ খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিতে হবে। বাজেট বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। গবেষণা খাতে বরাদ্দ অনেক কম। চলতি অর্থবছর ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও তা ব্যয় করা হয়নি। আশা করা যায়, পরবর্তী অর্থবছরে তা ব্যয় করা সম্ভব হবে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, জেলা পর্যায়ের বাজেট পরিকল্পনা, জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে চাহিদামাফিক এলাকাভিত্তিক বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং সরকারি বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত জনবলের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। আমাদের প্রত্যাশা আগামী বাজেটে সরকার এসব বিষয়ে উদ্যোগ নেবে।

কর্মসংস্থান বাড়াতে এসএমই খাত সম্প্রসারণে উদ্যোগ নিতে হবে

ব্যক্তিখাতের ওপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা বেগম বলেন, আগামী অর্থবছর বাজেটের আকার কী রকম হবে, সে বিষয়ে একটি খসড়া কাঠামো এর মধ্যে তৈরি হয়েছে। মূল প্রতিবেদন অনুযায়ী বাজেটের যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে— কর-জিডিপি অনুপাত অনেক কম, পরিচালন ব্যয় অনেক বেশি এবং প্রাপ্ত তহবিল পূর্ণমাত্রায় খরচ করতে না পারা। এছাড়া মুদ্রাবাজারে এক ধরনের অস্থিরতা চলছে। আমাদের রিজার্ভ বেশ চাপের মধ্যে রয়েছে। বিনিয়োগের সঙ্গে প্রবৃদ্ধি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মূল্যস্ফীতিকে কেন্দ্রীয় সূচক হিসেবে বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়গুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিষয়ে তিনি বলেন, এ কর্মসূচির আওতায় যেসব ভাতা দেয়া হয়, সেগুলো বিতরণের জন্য কিছু নির্দিষ্ট ব্যাংককে দায়িত্ব দেওয়া আছে। কিন্তু অনেক এলাকায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখা না থাকায় ভাতাভোগীরা নানা সমস্যায় পড়েন। ফলে বিতরণের জন্য ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া গবেষণার বরাদ্দ খরচ না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা গিয়েছে যে এ অর্থ ব্যয় করার জন্য যে কৌশল সেটা চূড়ান্ত করতেই অনেক সময় ক্ষেপণ হয়েছে। আগামীতে হয়তো এ অর্থ কিছুটা ব্যয় হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিবছর যখন বাজেট প্রণয়ন করা হয়, তখন ব্যক্তিখাত, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাসহ সমগ্র ব্যবসায়ী সমাজ বাজেটের কারণে তাদের ব্যবসার ওপর কী প্রভাব পড়বে সেটা নিয়ে খুব চিন্তিত থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকার বাজেটে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন অংশের জনগোষ্ঠীর জন্য যে সহায়তা ঘোষণা করে, সেগুলো সঠিক ব্যক্তির কাছে পৌঁছায় না। আর বাজেটের এ সুযোগ নিতে হলে এত বেশি জটিলতা মোকাবেলা করতে হয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সুবিধাটি আর গ্রহণ করতে পারেন না। যেমন— গত বছর কর্পোরেট কর হার কমানো হয়েছিল এই ধারণা থেকে যে, ব্যবসার খরচ কমবে, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারের কোম্পানির ক্ষেত্রে ভ্যাট মওকুফ থাকলেও এ সুবিধা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো পাচ্ছে না। এছাড়া বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের অনুমোদন লাগে যেটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। সাধারণত ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো এত জটিলতা মোকাবেলা করে সে সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না।

বাজেটে স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে আছে। বাজেটের বৈশ্বিক স্বচ্ছতার যে সূচক রয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর ৩৬, যেটি নিউজিল্যান্ডের ক্ষেত্রে ৮৭। নিউজিল্যান্ডের কাছাকাছি যাব এটি আমরা আশা করি না, তবে এটির একটি প্রক্রিয়া আছে। প্রতি ১০ বছর পরপর এটির একটি অবহিতকরণ (রিপোর্টিং) হয়। আর এর জন্য তাদের কিছু তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করতে হয়। সেই তথ্য উপাত্তগুলো বাংলাদেশ থেকে তেমনভাবে দেওয়া হয় না। এছাড়া হঠাৎ কোনো নীতি পরিবর্তন হলে কেনাকাটার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বেশ সমস্যার সম্মুখীন হন। পাশাপাশি অগ্রিম আয়কর (এআইটি) ও উৎসে কর কর্তনের (টিডিএস) কারণে কোম্পানিগুলোর কর্পোরেট কর বাজেটে ঘোষিত হারের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়, যা ব্যবসার জন্য মোটেই সহায়ক নয়। ব্যবসায়ীরা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পরিশোধযোগ্য কর্পোরেট করে এক শতাংশ ছাড় দাবি করেছেন। এ প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

বেকারত্বের বিষয়ে ফেরদৌস আরা বেগম বলেন, বিবিএসের উপাত্ত অনুযায়ী আমাদের দেশে বেকারত্বের হার মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ছয় শতাংশ। এ হার যুক্তরাষ্ট্র বা সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু কর্মসংস্থানের বড় অংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা কর ছাড় দাবি করার ক্ষেত্রে প্রতিবছর নতুন কতগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন সে যদি তথ্যটি দেন, তাহলে কর্পোরেট কর কমানোর বিষয়টি বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

বড় উদ্যোক্তারা এসএমই খাতের ক্ষেত্র সংকুচিত করে তুলছেন

এ বিষয়ে ফেরদৌস আরা বেগম বলেন, এসএমই উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে যে বড় উদ্যোক্তারা নিজেদের প্রধান ব্যবসা ছাপিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় ঢুকে পড়ছে। যেমন প্রাণের ২২৮টি এন্টারপ্রাইজ রয়েছে এবং তারা অনেক ধরনের ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে। এ ধরনের অন্যান্য বড় কর্পোরেটও এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সুবিধাজনক এমন সব ব্যবসায় বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। এতে করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসার সুযোগ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এ পরিস্থিতি থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের রক্ষায় প্রতিযোগিতা কমিশন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া এনবিআর নিজেই রাজস্ব আহরণের নীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করে। এক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পৃথক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে করার বিষয়ে ব্যবসায়ীরা দাবি তুলেছেন। তাছাড়া অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ বিষয়ে একটা নির্দেশনাও রয়েছে। এ নির্দেশনা যদি বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে তা ব্যবসার জন্য সহায়ক হতে পারে।

আদিবাসী, দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য চাই বিশেষ উদ্যোগ

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জনাব সঞ্জীব দ্রং বলেন, প্রতিবছর বাজেটের আকার বাড়ছে। গত অর্থবছর বাজেট ছিল পাঁচ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার। এবার ধারণা করা হচ্ছে বাজেটের আকার হবে ছয় লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। প্রতি বছর বাজেটের আকার বাড়লেও পাহাড়ের মানুষ, প্রান্তিক আদিবাসী এবং দলিত বা চা বাগানের মানুষের জীবনে এই বড় বাজেটের প্রতিফলন সেভাবে দেখা যায় না। জাতিসংঘ বলছে, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিক অবিচার ও বৈষম্যের শিকার। মূল প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে যে, এই মানুষগুলো কাঠামোগত বৈষম্যের শিকার। দুদিন আগে আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে দুই হাজার ৮২৪ ডলার হলো। এটির প্রতিফলন কী, তা একজন হাজং, সাঁওতাল বা খুমি আদিবাসীর কাছে জানতে চাইলে দেখা যায়, তাদের জীবনে এই মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রতিফলন নেই। তিনি বলেন, আমাদের দেশের শাসন কাঠামো মূল স্রোতধারার মানুষের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত। এখনো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী জানা যায়, বাংলাদেশে ৫০টি আদিবাসী জাতিসত্তা বসবাস করে। কিন্তু তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক পরিসংখ্যান দেশের কোনো মন্ত্রণালয়ের কাছে নেই।

তিনি আদিবাসী, দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন। এসব প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে—
১. করোনার কারণে আদিবাসী, চা বাগানের শ্রমিক ও দলিত জনগোষ্ঠী চরমভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন

এবং তারা এখনো করোনার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারেননি। তাই এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য যেন কমপক্ষে পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। ২. আগে জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অধ্যায় থাকত। কয়েক বছর ধরে সেটি দেখা যাচ্ছে না। সেটি যেন আবার সংযোজন করা হয়। ৩. বাজেট বরাদ্দ হয় মন্ত্রণালয়ভিত্তিক। যেহেতু সমতলের আদিবাসীদের জন্য কোনো মন্ত্রণালয় নেই, তাই তাদের দেখভালের জন্যও কেউ নেই। তাই সব মন্ত্রণালয়ের বাজেটে যেন এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে। ৪. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে আদিবাসী উপকারভোগী হওয়া নিশ্চিত করতে হবে। ৫. আদিবাসী ও দলিত চা বাগানের শ্রমিক জনগোষ্ঠীর তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। ৬. এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও তাদের সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং সেজন্য একটি কাঠামো তৈরি করতে হবে। ৭. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আদিবাসীদের বিষয়টি উল্লেখ করা আছে। এ বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করতে হবে।

বক্তব্যের সমাপ্তি টেনে সঞ্জীব দ্রং বলেন, আদিবাসী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো যদি তাদের মতো করে রাষ্ট্র হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, তাহলে হয়তো বাজেটে তাদের জন্য লক্ষ্যনির্দিষ্ট পদক্ষেপ দেখা যাবে।

মোস্তাফিজুর রহমান সঞ্জীব দ্রংয়ের বক্তব্যের সূত্র ধরে বলেন, সমাজে যারা অনেক বেশি পিছিয়ে আছেন, তাদের যদি আমাদের সার্বিক গড়ের সমপর্যায়ে আনতে হয়, তাহলে তাদের দিকে তুলনামূলকভাবে বেশি নজর দিতে হবে। বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের কথা আমরা বলি, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কথা বলি— সে ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি টেস্ট কেস হবে এই আদিবাসীদের প্রতি রাষ্ট্র কেমন নজর দিচ্ছে সেটি। আর এটি প্রতিফলিত হবে তাদের জন্য বাজেট বরাদ্দের মধ্য দিয়ে।

জলবায়ু পরিবর্তনকে মাথায় রেখেই বাজেট প্রণয়ন করতে হবে

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ে অ্যাকশনএইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির বলেন, কার্বন নির্গমন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে পরিবেশ রক্ষায় এখনই জোরালো পদক্ষেপ না নিলে পৃথিবী বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। বিষয়টি আইপিসিসির প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের নানা ধরনের প্রভাব পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে বাজেটের জলবায়ু পদক্ষেপের জন্য কোনো বরাদ্দ আছে কিনা, সেটি দেখতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, অ্যাকশনএইড ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জলবায়ুর জন্য যে বাজেট, তা কয়েক অর্থবছর ধরে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে দেখা যায়, ক্রমান্বয়ে এ খাতে বরাদ্দ কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু সেটি আরও অনেক মাত্রায় বাড়ানো প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ বাড়িয়ে কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দেয়া সম্ভব? কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবনধারণের সার্বিক প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর মাধ্যমে তাদের এ দুর্ভোগ কিছুটা হলেও লাঘব করা সম্ভব।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জীবনধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি এসব জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বাল্যবিয়েও বেড়ে যায়। বাজেট বরাদ্দের কথা বললে সবুজ অবকাঠামোতে অর্থায়নের বিষয়ে বেশি জোর দেয়া হয়। কিন্তু এর সাথে জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সামাজিক সূচকগুলোকেও গুরুত্ব দিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়, তার জন্য কি বাজেটে কোনো বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে বা আমাদের নীতিনির্ধারকরা কি সে বিষয়টি বিবেচনা করছেন? তিনি এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

ফারাহ কবির বলেন, অ্যাকশনএইড নানা মাধ্যমে ২০২১—২২ অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু খাতে বরাদ্দের একটি পরিসংখ্যান জোগাড় করেছে। তাতে দেখা যায়, ২৫টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকার মতো বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বাজেট তা কমে যায়, বিশেষ করে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ কমে গেছে। তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আসলে কতটা মনোযোগ দেয়া হচ্ছে? আমরা এমন একটি দেশে বাস করি, যেখানে

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতা— সব ধরনের দুর্যোগই রয়েছে। এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে জলবায়ুকেন্দ্রিক বাজেট তৈরি করা হচ্ছে কিনা, তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। স্থানীয় সরকারের বাজেটেও জলবায়ুর বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি মারাত্মক অভিঘাত হলো বাস্তুচ্যুতি ও কর্মসংস্থান পরিবর্তন। এসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য বরাদ্দ নিশ্চিত হচ্ছে না। যেসব বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, সেগুলো বিতরণের ক্ষেত্রে জলবায়ুর বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। দুর্যোগপূর্ব আগ্রীম অর্থায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জলবায়ু বীমা ও শস্য বীমার বিষয়টি জোরালো করে তুলতে হবে। স্বাস্থ্যখাতেও জলবায়ুকে বিবেচনায় রেখে কিছু বরাদ্দ রাখতে হবে। ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য গবেষণায় বরাদ্দ থাকতে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার করতে হবে।

বাজেটের জন্য সুপারিশ দিয়ে ফারাহ কবির বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনকে মাথায় রেখেই আসন্ন জাতীয় বাজেট তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রেখে সেই এলাকার জন্য উপযোগী খাতে বরাদ্দ দিতে হবে। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডসহ এ ধরনের তহবিলগুলোয় পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু অর্থায়নের জন্য আন্তর্জাতিক যেসব অঙ্গীকার রয়েছে, সেগুলো সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। তা না হলে প্যারিস চুক্তির পরও কেন এ বিষয়ে কোনো জোরালো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না? জিডিপি বা অর্থনৈতিক সূচকের পেছনে না ছুটে সামাজিক সূচকগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে জলবায়ু বাজেট নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে। এসবের প্রেক্ষাপটে সরকার ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে যৌথ টাস্কফোর্স গঠন করা খুবই প্রয়োজন। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ফারাহ কবিরের বক্তব্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। তার মধ্যে জোরালোভাবে যে বিষয়টি তিনি বলেছেন সেটি হলো জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান অভিঘাত ও আগামী দিনের অভিঘাত মূল্যায়ন করে সে অনুযায়ী লাগসই পদক্ষেপ নিতে হবে। জলবায়ুর অভিঘাতের বিষয়টি সামাজিক সূচকের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সূচকের সঙ্গেও জড়িত। আজকের আলোচনায় যে বিষয়টি সবার বক্তব্যে উঠে এসেছে, তা হলো তৃণমূলের মানুষ ও প্রান্তিক মানুষের ওপর যে অভিঘাত হচ্ছে সেটাকেই বিবেচনায় নিয়ে বাজেটের বরাদ্দ কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। সামনের বাজেটে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আশা করা যায়, আগামী বাজেটে এসব বিষয়ের যথাযথ প্রতিফলন ঘটবে।

প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বাড়তি সুবিধার প্রয়োজন

আলোচনার সমাপ্তি টেনে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান সরকার সম্ভবত তার সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতি নিয়ে আগামী নির্বাচনের দিকে ধাবিত হবে। সেই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয়বিধ কারণ রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন সময়ে যদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় এবং তা যদি হয় মূল্যস্ফীতির কারণে, তাহলে সেই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষ ও নিম্নমধ্যবিত্ত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আগামী বাজেটের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি এই মানুষগুলোর ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কী ধরনের সহায়তা দেয়া যায়, সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া। আর এক্ষেত্রে ভর্তুকির ব্যবহার একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। ভর্তুকি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার যদি আরও দক্ষতা আনতে পারে, আরও সমন্বয় করতে পারে, তাহলে এই জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করা কিছুটা হলেও সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি। ভর্তুকির পাশাপাশি আগামী দিনে সুদের হার ও টাকার বিনিময় হার সমন্বয়ের মাধ্যমে একটা সুরক্ষা দেয়ার সুযোগ আছে। এছাড়া প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বাড়তি সুবিধা প্রয়োজন হবে বলে আমরা মনে করি।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সভাপতি

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম
এবং
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রারম্ভিক বক্তব্য

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
এবং
সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
এবং
সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

আলোচকবৃন্দ

জনাব টনি মাইকেল গোমেজ
পরিচালক
টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম, এডভোকেসি ও যোগাযোগ
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

ড. রুমানা হক
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মিজ ফেরদৌস আরা বেগম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

জনাব সঞ্জীব দ্রং
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

মিজ ফারাহ কবির
কান্ট্রি ডিরেক্টর
একশনএইড বাংলাদেশ

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: শাহরিয়ার আলম অপূর্ব এবং অন্বেষা জাফরিন

সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

আয়োজক

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs Citizen'sPlatformforSDGsBangladesh bdplatform4sdgs

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net